দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০১-০৬-২০২৩ (পৃঃ ০১,০৬)

খাদ্যনিরাপত্তায় বৃহত্তম উদ্যোগ 'পার্টনার'

প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা

■ নিজামুল হক

বিদ্যমান কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে পরিবর্তন এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে নানামুখী কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন করবে কৃষি বিভাগ। এ লক্ষ্যে একটি বড় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৬ হাজার ৯১০ কোটি টাকা। আগামী জুলাই থেকে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে। 'প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফর্মেশন ফর নিউট্রিশন এন্ট্রাপ্রেনিওরশিপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)' শীর্ষক এই প্রকল্পে অর্থায়ন করবে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সাতটি সংস্থা—কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

খাদ্যনিরাপত্তায় বৃহত্তম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পটির ৬ হাজার ৯১০ কোটি টাকার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ১ হাজার ১৫১ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য প্রায় ৫ হাজার ৭৫৯ কোটি টাকা। প্রকল্পটির সময়কাল ধরা হয়েছে ২০২৩ হতে জুন ২০২৮।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ফল ও ১০টি গুরুত্বপূর্ণ সবজির প্রটোকল প্রস্তুত করা হবে। এতে ফলে সবজি উৎপাদন থেকে শুরু করে রপ্তানির পুরো প্রক্রিয়া থাকবে। এছাড়া সরকার গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিসেস মাধ্যমে ফল ও সবজির আওতাধীন এলাকা ৩ লাখ হেক্টর এবং উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত ২ লাখ হেক্টরে উন্নীত করার পরিকল্পনা করেছে।

এই প্রকল্পের আওতায় ১০ লাখ কৃষককে উত্তম কৃষি চর্চার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দেশের বীজ নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা হবে। সব ধরনের বিরূপ পরিবেশ সহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল পাঁচটি ধানের জাত উদ্ভাবন করা হবে। অন্যান্য ফসলের ১৫টি জাত উদ্ভাবন করা হবে। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে ১ লাখ হেক্টর নতুন কৃষিজমি সেচের আওতায় আনা হবে।

দেশের ৬৪ জেলায় ৪৯৫টি উপজেলায় ২ কোটি ২৭ লাখ কৃষককে সব ধরনের তথ্যসংবলিত স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে। ১০টি অ্যাক্রিডেটেড ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে। ধান ও ধান-ভিন্ন অন্যান্য ফসলের আবাদ সম্প্রসারণে প্রকল্পের আওতায় যথাযথ প্রযুক্তিগত ও দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। খাদ্য রপ্তানির ক্ষেত্রেও আধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপনের মাধ্যমে খাদ্যের মান নিশ্চিত করা হবে।

কৃষিবিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি বাস্তবায়ন হলে কৃষিকে এক নতুনরূপে দেখা যাবে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষিকে বৈচিত্র্য আসবে। বিদ্যমান কৃষি বাণিজ্যিক কৃষিতে পরিণত হয়, রপ্তানি আয় বাড়বে।

কৃষি বিজ্ঞানীরা বলছেন, বাংলাদেশের টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে সরকারের জাতীয় কৃষি নীতি-২৯১৮-এর লক্যমাত্রা অনুযায়ী দেশের কৃষি সেক্টরের গবেষণা কার্যক্রমের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, সম্প্রসারণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়ন, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ফসলোত্তর ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন, বিপণন এবং লজিস্টিক অবকাঠামো উন্নয়ন জরুরি। এছাড়া দেশের কৃষির বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরকে সহজতর করার জন্য কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ প্রয়োজন। মানবসম্পদ উন্নয়নসহ কৃষি সেক্টরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়াও গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন। কৃষিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে।

এই প্রকল্পটি দেশের আটটি বিভাগ, ১৪টি কৃষি অঞ্চল, ৬৪টি জেলাসহ ৪৯৫টি উপজেলার মোট ৪ হাজার ৫৭১টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটি দেশের কৃষির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ দেশের কৃষি সেক্টরের বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরে জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮-এর কর্মপরিকল্পনা ২০২০ ও উত্তম কষিচর্চা নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নসহ এসডিজি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ও ডেলটা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. লুৎফুল হাসান বলেন, এই প্রকল্পের কৃষি উন্নয়নের সবগুলো দিক বিবেচনায় আনা হয়েছে। প্রকল্পটি পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে কৃষির ব্যাপক উন্নয়ন হবে।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০১-০৬-২০২৩ (পৃঃ ০৪)

নতুন প্রজাতির ধান

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারও সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারসহ সৃজনশীল উদ্ভাবনের ওপর। এরই অংশ হিসেবে ব্রি-র বিজ্ঞানীরা ধানের পাঁচটি নতুন জাত বা প্রজাতির উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন, যেগুলোর একর প্রতি ফলন ক্ষমতা বেশি, চাল সরু, সুগন্ধি ও উন্নতমানের। নতুন প্রজাতিগুলো হলো– ব্রি-ধান ৮৮, ব্রি-ধান ৮৯, ব্রি-ধান-৯২, ব্রি-ধান ৯৬ এবং বঙ্গবন্ধু ধান-১০০। এসব প্রজাতির ধানের ফলন সর্বনিম্ন ২৮ মণ থেকে সর্বোচ্চ ৩৫ মণ। রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, উচ্চফলনশীল। মূলত ব্রি-২৮ ও ব্রি-২৯ জাত দুটি তিন দশকের পুরনো হয়ে যাওয়ায় এগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে গেছে। চলতি বোরো মৌসুমে ব্রি-২৮ জাতটি বিশেষ করে ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়েছে বেশি। ফলে, ফলন হয়েছে কম। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন চাষিরা। এ কারণে কৃষি মন্ত্রণালয় চাইছে পুরনো জাতগুলো প্রত্যাহার করে নতুন উচ্চফলনশীল জাতের চাষাবাদ মাঠপর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে। এবার যেমন বিনা-২৫ জাতের ধান প্রথম আবাদেই বাজিমাত করেছে মাঠপর্যায়ে উচ্চফলন ও উন্নতমানের ধান-চাল উৎপাদনের মাধ্যমে। চাল সরু ও সুগন্ধি বাসমতিতুল্য। ব্রি-র বিজ্ঞানীরা এও বলেছেন যে, নতুন প্রজাতির ধান যে অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়ার উপযোগী, সেই এলাকার জাত দেবেন কৃষককে চাষাবাদের জন্য। ব্রি- র বিজ্ঞানীদের পাইপলাইনে রয়েছে আরও কয়েকটি নতুন প্রজাতির ধান, যা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক দেশের কৃষির উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য।

ব্রি- র বিজ্ঞানীদের পাইপলাইনে রয়েছে আরও কয়েকটি নতুন প্রজাতির ধান, যা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক দেশের কৃষির উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বিজ্ঞানী ও গবেষক দল বছর শেষে বড় একটি প্রবল আশা ও আশ্বাসের কথাও শুনিয়েছেন দেশবাসীকে। আপাতত খাদ্য ঘাটতি কিংবা খাদ্য সংকটের আশঙ্কা নেই। বরং আমন ও বোরোর বাম্পার ফলন হওয়ায় দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্য চাহিদা পূরণ করেও আগামী বছর অর্থাৎ, ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত উদ্বৃত্ত থাকবে ৩০ লাখ টন চাল। দেশের ১৪টি কৃষি অঞ্চল জরিপ, মাঠপর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, কৃষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সর্বোপরি উপগ্রহচিত্র ব্যবহার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তারা। এর পেছনে ব্রি-র সঙ্গে জড়িত বিজ্ঞানী ও গবেষক দলের উচ্চফলনশীল ধানের বীজ উদ্ভাবন, খরা ও লবণাক্ত পানি সহিষ্ণু ধান বীজের ব্যবহার ইত্যাদির অবদানও কম নয়। ব্রি জানিয়েছে, চলতি বছর আউশ-আমন-বোরো মিলিয়ে মোট চাল উৎপাদন হবে ৩৭ দশমিক ৪২ মিলিয়ন টনের বেশি। চাহিদা ও জোগানের হিসাব বিশ্লেষণে দেখা যায়, অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে কমপক্ষে উদ্বৃত্ত থাকবে ৩০ লাখ টন চাল।

তবে দেশে ধান-চালের দামে প্রায়ই অস্থিরতা ও উল্লম্ফন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, যার অসহায় শিকার হতে হয় সাধারণ মানুষকে। অন্যদিকে কৃষক প্রায়ই ধান-চালের ন্যায্যমূল্য পান না, সরকারের ধান-চালের ক্রয়নীতি ও মূল্য নির্ধারণ সত্ত্বেও। মাঝখান থেকে লাভবান হয় মধ্যস্বত্বভোগী, ফড়িয়া, চাতাল মালিক, পরিবহন ব্যবসায়ীসহ পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতারা। অনুরূপ প্রায় প্রতিটি কৃষি পণ্য, ফল-ফুল, শাক-সবজি, মাছ, মাংসে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সরকার কৃষককে স্বস্তি দিতে ধান-চালের সংগ্রহ মূল্যও বাড়িয়েছে সময় সময়। অবশ্য মধ্যস্বত্বভোগী, আড়তদার ও চাতাল মালিকদের দৌরাত্ম্য এবং দাপটে মূল্যবৃদ্ধির এই সুফল শেষ পর্যন্ত কৃষকের ঘরে পৌঁছতে পারে না। কৃষকের স্বার্থরক্ষায় এদিকে নজর দিতে হবে সরকারকে।